মানুষের ধর্ম–মানবতা

সুমিত্রা পদ্মনাভন

এই 'মানি না' বলাটা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। কারণ মেনে চলারই দলে ভারী-তারা সংগঠিত। তাই মানবতাবাদীদের ও সংগঠিত হওয়ার সময় এসেছে। যাঁরা প্রতিকুল পরিবেশে একা লড়ছেন, তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেই এই সংগঠিত আন্দোলন আজ দানা বাধছে। তাঁদেরকে শুধু 'নাস্তিক পরিচয় আশ্রয় দিতে পারে না। তাই যতদিন না ধর্ম পরিচয় অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হচ্ছে-ততদিন বিকল্প হিসেবে মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাড়াতে, সমাজে মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এই মানবতাবাদীদের একজোট হতে হবে। ...

ধর্ম নিয়ে আমি একটা খুব সহজ লেখা লিখতে চাই, যেটা সবাই পড়ে বুঝতে পারবে। ধর্ম যেহেতু সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকেই প্রভাবিত করে, তাই ধর্মকে একটা কঠিন গবেষনার বিষয় হিসেবে দেখা উচিৎ নয়। জন্ম, মৃত্যু বা ভালোবাসার মত বিশ্বজনীন এবং সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় হিসাবেই দেখা উচিৎ, দেখানো উচিৎ।

কিন্তু সবসময় তো তা হয় না। আমরা প্রায়শই দেখি ধর্মবিষয়ক আলোচনা হয় কিছুটা গবেষনামূলক, কিছুটা উপদেশমূলক। তার ভাষাও হয় সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই দুর্বোধ্যতাই ধর্মতত্ত্বকে সাধারণের চোখে myistic (রহস্যময়) করে তোলে। ধর্মগুরুদের করে দেয় Superman (অতিমানব)। মন্ত্রোচ্চারণের আলো-আঁধারি যে ধর্মীয় বাতাবরণ তৈরি করে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে যে ভয়-ভক্তির সঞ্চার হয়, তার অনেকটাই না বোঝার কারণে। অর্থাৎ একটা বিষয়কে ভালো করে জানি না, বুঝি না বলেই সেটাকে ভক্তি করি-সেটাতে আকৃষ্ট হই। এই যে উল্টো কারণে আকৃষ্ট হওয়া এটাতেই যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষের আপত্তি। এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিবাদের বিরোধ। একটি সহজ উদাহরণ দেই : একেকটা পুঁজোর প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র যদি সোজা বাংলায় অনুবাদ করে গড় গড় করে পড়ে যাওয়া যায়- তাহলেই তার সব রহস্যময়তা ঘুচে যাবে। তখন তার আকর্ষণ কমে যেতে বাধ্য। অনেক সময় কিছুটা হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্গিকও মনে হতে পারে। আবার তার মধ্যে কিছু চিরন্তন সত্যও পাওয়া যেতে পারে। আর সেটা জেনে বেছে নেওয়ার জন্যেই দরকার আগে বুঝে নেওয়া। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অপ্রয়োজনীয় বাহ্যিক রীতিনীতিকে বাদ দিতে হলে তাই প্রথমে ধর্ম কি ও কেন এটা সহজ ভাবে বুঝতে হবে। এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আমরা সবাই

বর্তমান সামাজিক অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যে ভূমিকা তাতে খুশি তো নই-ই- বরং অবশ্যই কিছু পরিবর্তন ও বিকল্প চাইছি। চাইছি যুক্তিবোধ ও ন্যায়বিচার।

প্রথমে দেখা যাক ধর্ম কথাটার অর্থ কি? চলন্তিকা বাংলা অভিধানে এর মানে করা হয়েছে **সৎকর্ম, সদাচার, পুণ্যকর্ম, কর্তব্যকর্ম, সমাজ হিতকর বিধি।**

আরেকটি অর্থ হ'ল- পরম্পরাগত সামাজিক আচার-আনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, সংস্কার রীতিনীতি এবং ঈশ্বর পরকাল ইত্যাদি বিষয়ক মতামত।

তৃতীয় অর্থে বস্তু বা ব্যক্তি নির্বিশেষে- স্বভাব, গুন বা শক্তি।

এই শেষ সঙ্গাটি বস্তুর উপর যেভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ পদার্থের ধর্ম, আগুনের ধর্ম, তরল বা মৌলিক পদার্থের ধর্ম, সেই অর্থে মানুষের উপর প্রয়োগ করলে পাই মানুষের বিশেষ স্বভাব বা গুন। যদিও আমরা জানি মানুষের গুনের বদলে মেলা দোষও থাকতে পারে-আমরা তাকে ধর্ম বলবো না। ধর্ম বলবো সেই সব বিশেষত্বকে যা আদর্শ মানুষের গুনাবলী, যা মানুষকে সভ্যতার পথে এতদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে-মানুষকে মানুষ করেছে। অর্থাৎ প্রথম সঙ্গানুযায়ী সৎকর্ম, সদাচার, কর্তব্যকর্ম সমাজহিতকারিতা ইত্যাদি।

ধর্মের এই বিস্তৃত সঙ্গা থেকে এসেছে দ্বিতীয় সঙ্গা, যাকে আমরা বলতে পারি ধর্মের সংকীর্ণ সঙ্গা। সংকীর্ণ, কারণ এটা স্থান কাল ভেদে পাল্টেছে, পাল্টাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা পদ্ধতি আচার অনুষ্ঠান কতটা আলাদা তা তো আমরা জানি, ঈশ্বর সম্পর্কে মতও হরেকরকম। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর নেই। হিন্দুদের আছে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর ব্রাহ্মধর্মে পরমপিতা হচ্ছেন নিরাকার। তাহলে এই দ্বিতীয় সঙ্গা থেকেই আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রূপগুলি। অথচ ''সমাজহিতকর পুন্যকর্ম বা কর্তব্যকর্ম'' সঙ্গাটি কিন্তু বিশ্বজনীন রূপ নিতে পারতো- হতে পারতো সকলের জন্য এক ধর্ম। কিন্তু তা তো হয় নি। স্থান কাল ভেদে আচার অনুষ্ঠান পরম্পরাগত বিশ্বাস পাল্টে গেছে। কারণ প্রতিটি আলদা গোষ্ঠীপতি বা গ্রামের মোড়ল যেমন তার নিজের মতো করে নিয়মাবলী তৈরি করে, ধর্মের প্রবর্তকরাও তাই করেছে। প্রতিষ্ঠাতার রচনায় ও প্রচারে তাই পৃথক পৃথক রূপ নিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো। আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হল ধর্মের মোড়লরা ও তাদের অনুসরনকারীরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। প্রতিটি ধর্মগুরু তাই আজও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা ও উদার প্রগতিবাদী কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজের ধর্মমতটির শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না। অনুগামীরা ক্রমশই ভুলে যেতে থাকলো ধর্মের আসল সমাজহিতকর উদ্দেশ্য। প্রকট হতে থাকল আচার বিচার প্রকরন পদ্ধতি। মাঝে মাঝে প্রতীকী সমাজ সেবা করে পুন্যার্জন করার মধ্যে আবদ্ধ রইলো তাদের সদাচার। বাড়তে লাগলো বিভেদ। শুরু হল মৌলবাদীদের তান্ডব বিশ্বজুড়ে। মৌলবাদীরা তো ধার্মিকই। অতিমাত্রায় ধার্মিক।

এখন আর পৃথিবী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত

নয়। এখন তাই আলাদা আলাদা নিয়মকানুনগুলো সমন্বয়ের চেয়ে বেশি সংঘর্ষের কারণ হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই।

শিক্ষিত মহলের একটি প্রিয় উক্তি হচ্ছে- ''কেন? সব ধর্মেই তো ভালোবাসার কথা, সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে- তাহলে ধর্ম কি দোষ করলো? থাক না প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো মিলে মিশে।'' তারপর একটু গভীরে গেলেই উদারতার মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে আসল চেহারা। তখন দেখা যায় প্রতিটি তথাকথিত ধার্মিক মানুষই কি মমতায় আঁকড়ে থাকে বাপ ঠাকুর্দার ধর্মটিকে, কি সযত্নে এড়িয়ে যায় বা ভুলে যায় জন্মসুত্রে পাওয়া ধর্মটির দোষত্রুটিগুলোকে। কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষন করে পরধর্মের ত্রুটি বা ভ্রান্তবিশ্বাসকে। ভুলে যায় তার ধর্মটি সে নেহায়তই উত্তরাধিকারসুত্রে পেয়েছে-দেখে শুনে বেঁছে নেয়নি। তাই শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব করা সাজে না।

অর্থাৎ বিরোধ যতো তা সবই মূলত আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, ঈশ্বর সম্পর্কিত মতামত-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মিল যেখানে তা হলো-ন্যায়বোধ, কর্তব্যকর্ম, সৎগুন, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে। তাহলে আজ এই বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা কেন ভুলে যাবো ধর্মের আসল উদ্দেশ্য? কেন আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্যিক পদ্ধতি প্রকরণকে ছেঁটে ফেলতে পারব না? কেন মেনে নেব না মানবিক গুনকেই ধর্ম বলে?

নিশ্চয়ই পারবো। পুরনো ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মগুরুদের আদেশকে অভ্রান্ত বলে মেনে না নিলেই পারবো। সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞানে যা পরীক্ষিত সত্য তা নিয়ে খোলা মনে পড়াশোনা করে নিলেই পারবো ন্যায়-অন্যায়ের, ঠিক ভুলের বিচার করতে। বেরিয়ে আসতে পারবো ভয় ও অজ্ঞতাজনিত অন্ধভক্তির গন্ডি থেকে। তখন আর মন্ত্রকে যাদুশক্তি বলে ভুল হবে না, কষ্টকর অমানবিক আচার বিচারকে আদর্শ ধর্মাচরন বলে ভুল হবে না। সত্যকে এড়িয়ে না গিয়ে তাকে জানার চেষ্ঠায়ই সঠিক ধর্মাচরণ। এই জানার চেষ্টায়ই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানবধর্ম।

১৯৮১ সালের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষনা করেছে-'' প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা আছে ব্যক্তিগত ভাবে বা সংঘবদ্ধ ভাবে নিজের পছন্দমত বিশ্বাস বা ধর্মকে অনুসরণ করার।'' অর্থাৎ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তার নিজের পছন্দমত ধর্মমত বা বিশ্বাস গ্রহণ করতেই পারেন। পিতা-মাতার ধর্মকেই মেনে নিতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ অনেকেই এই সহজ কথাটা জানেন না।সেই ছোট বেলায় চাপিয়ে দেওয়া, না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ করা, ভয়-ভক্তি মেশানো ধর্মের গন্ডি থেকে বেরিয়ে তাই অনেকেই এখনও মনে করেন অসম্ভব বা অন্যায়।

প্রথম মানবধর্ম সমাজের ধারণা অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে নিউইয়র্কে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অধিকার ঘোষনার অনেক আগে। তাই মানব ধর্মীরা তখন ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে

স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু আজ, UNO-এর ধারা অনুযায়ী স্বীকৃতি না পাওয়ার কোন কারণ নেই। ১৯২৯ এ পাশ্চাত্যে " Humanism " নামে যে নতুন পন্থার জন্ম হয়েছিলো সেটা ছিলো ইহুদী-খ্রিষ্টান কট্টর পন্থীদের অবিরাম সংঘর্ষের একটা ফলস্বরূপ। তখনকার গন্যমান্যরাই ছিলেন এই দলে। প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে ছিলেন একজন ইহুদী (জন্মসুত্রে) ধর্মযাজক ও কয়েকজন একেশ্বরবাদী পাদ্রী। তখনকার সমাজে সমস্ত ব্যাপারে ধর্মীয় ধ্বজাধারীদের খবরদারীর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এই নতুন আদর্শ, নতুন জীবন দর্শন উঠে এসেছিল। এরা মানব ধর্মকে অন্য সমস্ত প্রচলিত ধর্মের বিকল্প হিসাবে চেয়েছিলেন। এদের উপদেষ্টামন্ডলীতে ছিলেন Albert Einstein, Will Durant, Thomas Mann, Julian Huxley ইত্যাদি জ্ঞানী গুণী বোদ্ধারা। এদের পথপ্রদর্শক ছিল আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান। এদের আস্থা ছিল, প্রত্যয় ছিল। ছিল না অন্ধবিশ্বাস। এদের আস্থা ছিল গণতন্ত্রে, বিজ্ঞানে, সব মানুষের সমান অধিকারে। সে যুগে ধর্ম হিসেবে এটি স্বীকৃতি পায়নি।

এখন এই ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগে অনেক বিশ্বাস যা Cult বা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে উঠে এসেছে, তার আলাদা স্বীকৃতি চাইছেন। যেমন রামকৃষ- ভক্তরা ' Ramkrishnaite ' হিসেবে আলাদা ধর্মীয় স্বীকৃতি চাইছিলেন বেশ কিছু বছর ধরেই কিন্তু তারা মূলত হিন্দু বলেই তাঁদের এই আবেদন বাতিল করে দেয় সরকার।

অবাক লেগেছিল যখন একজন সফল আবেদনকারীর চাকরীতে ঢোকা নাকচ হয়ে যায় শুধু " ধর্ম " কলামে ' মানবতাবাদ ' লেখার জন্য। যেন মানবিক হওয়াটা খুব গর্হিত কোন ব্যাপার। সেটা ১৯৯২-১৯৯৩ সাল। তখন যুক্তিবাদী আন্দোলন তুঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ছেলে-মেয়েরা আবেদন পত্রে " ধর্ম " কলাম তুলে দেয়ার দাবি জানাচ্ছে। 'ধর্ম ' যেহেতু ব্যক্তিগতব্যাপার তাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় পরিচিয় জানানো জরুরি নয়। যারা কোন ধর্ম মানেন না তারা কলামটা খালি রাখতে চাইলেও আপত্তি উঠেছে নানা জায়গায়। Form বাতিল করা হয়েছে Incomplete বলে। সেই সময় বহুমানুষ দ্বারস্থ হয় মানবতয়াবাদী সমিতির। এই সময় প্রথম এই সমিতি Humanists' Association Of India সক্রিয় হয় মানবতাকে ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে যোগাযোগ করে ঘটনাটি জানানো হয়। যাতে একজন মানুষ নিজের ধর্ম ' মানবতা ' বলতে পারে তার জন্য সরকারি কোনও নিয়ামাবলী বা Guideline আছে কিনা তা স্পষ্ট ভাবে জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে রামকৃষ- মিশনের ঘটনার উল্লেখ করে সবাই বলেন যে এভাবে নতুন ধর্ম তৈরি করা সম্ভব নয়।

তারপর মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় রাষ্ট্রসংঘের অফিসে। উত্তর আসে দেরি না করেই। UNO তাদের Human rights এবং Religious rights সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়- "১৯৮১" এর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষনা করেছে প্রতিটি মানুষের যে কোন ধর্মমত গ্রহন ও চর্চা করার স্বাধীন অধিকার

আছে।

তারপরই এই আইনী লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে মানবতাবাদী সমিতি ও যুক্তিবাদী সমিতি। রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি দিয়ে জানানো হয় যে ভারত UNO -র সদস্য দেশের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মকে এখানে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। Humanism কে ও ধর্ম বলে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু যেহেতু UNO তার Guideline পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা UNO এর অন্তর্গত দেশ হিসাবে মনে করি মানবতা আমাদের ধর্ম হতে কোন বাধা নেই। এবং আইনীভাবে এই ধর্মমতকে গ্রহন করার অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করবো। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশী দূতাবাসগুলিতেও। তারপর ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সহায়তায় কোর্টে গিয়ে affidavit করে দলে দলে ছেলে-মেয়ে Humanism কে ধর্ম হিসেবে গ্রহন করে (১৯৯৩ এর ১০ ডিসেম্বর)।

১৯৯৩ এর ১০ ডিসেম্বর ''বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ''-এ প্রথম ৫৪ জন সদস্য-সদস্যা আইনী ভাবে Humanist হন। এই কঠিন লড়াইটা জেতার পর এখন আর কোন বাধা নেই-যে কোন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশে এই একইভাবে যে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। আইনী কাগজে Humanist ঘোষিত হওয়ার পর তাকে অস্বীকার করার অর্থ কোর্টের অবমাননা করা। তারপর Humanist দের কার্যকলাপ শাখা বিস্তার করেছে নানা ভাবে। বিভিন্ন বিজ্ঞানক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংস্থা স্বাধীনভাবে মানবতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। মানবতাবাদীদের সংখ্যা এখন আর কম নেই। তাঁরা যেহেতু প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি মানেন না, 'মরণোত্তর দেহদান' কর্মসূচি তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে চলছেন। মৃত্যুর পর দেহটাকে প্রচলিত প্রথায় সৎকার না করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যবহারে কাজে লাগানোর জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের নিয়মমত।

তবু এখনও লক্ষ মানুষ আছেন যাঁরা এই আন্দোলন থেকে শতযোজন দূরে। অনেকে আছেন যাঁরা এতসব জানার পরেও মনে করেন এই প্রচলিত ধর্মকে বাদ দেয়াটা এখনও সম্ভবপর নয়। চেষ্টা করাটাই সময়ের অপচয়। মানবতাবাদী আন্দোলনের সাফল্যই তাঁদের সংশয়ের জবাব। অনেক শুভানুধ্যায়ী আছেন যাঁরা মনে প্রাণে সত্যিকারের মানবতাবাদী কিন্তু খাতায় কলমে মানবধর্মী হননি। হয়তো তাঁদের কিছু দ্বিধা আছে। হয়তো আত্মীয় বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন মনে করে এগিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করছেন। এরকম মানুষদের কাছ থেকে দুটো সুচিন্তিত মতামত বা প্রশ্ন পেয়েছি যে গুলোর উত্তর দেয়াটা জরুরি। **প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে**- এত ধর্ম থাকতে আবার একটা নতুন ধর্ম ''**মানবধর্ম** ''? তাহলে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব না তো? মানবিক হতে হলে আবার কাগজে সই করতে হবে কেন?

আবার একটি নতুন ধর্ম কেন?

এর উত্তরে একটা কথা বুঝতে হবে, প্রথম যারা মানবতাবাদী হয়েছেন- তারা সবাই জন্মসুত্রে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মালম্বী ছিলেন। কিন্তু সেই উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া ধর্মটিকে তাঁরা ত্যাগ করেছেন। যতটা নিরপেক্ষতা তাঁদের আছে পিতা-মাতার ধর্মের প্রতি ততটাই নিরপেক্ষতা আছে অন্যান্য সব ধর্মের প্রতি তাই তাঁরা বিচার করে নির্দ্বিধায়, পক্ষপাতহীনভাবে। তারা কিন্তু কেউ সমাজবিচ্ছিন্ন নন। প্রত্যেক ধর্মালম্বীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন এমন মানুষ-যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ত্রুটি ও বিভ্রান্তি গুলোর সঠিক নিরপেক্ষ বিচার করেন নির্দ্বিধায়। নাকচ করেন হাসিমুখে। অসততা বা ভন্ডামির গন্ধ পেলে বাতিল করেন সহজেই। এমন নিরপেক্ষ সৎ সাহসী মানুষেরা সর্বত্রই আছেন। তারা আত্মীয়-বন্ধু পরিবৃত্ত হয়ে আছেন। তারা শারদীয় উৎসবে আনন্দ করেন, অঞ্জলি দেবার প্রয়োজন বোধ করেন না। ঈদের উৎসবে খাওয়া দাওয়া করেন, কোরবানির ধার ধারেন না। পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে কেদারনাথের পথে পাড়ি দেন, মন্দিরে পুঁজো দেন না। তাঁরা কেউ আলাদা হন নি। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ বলে। তাঁরা প্রভাবিত করেন বন্ধুদের। নিজেরা বর্জন করেন সমস্ত রকম অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানকে। ধর্মপরিচয় বহনকারী পদবী বা পোশাক বা স্টাইল বর্জন করেন। এদের অনেকেই পদবী ত্যাগ করেছেন, বিয়ে করেছেন Special Marriage Act মেনে, মেয়েরা বিয়ের পরও স্বামীর পদবী নেন নি, স্টাইল করেন নিজের রুচি অনুযায়ী তবে কোথাও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মানবতাধর্মী হতে গেলে কোন কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় না, দীক্ষা দিতে হয় না, কোনও বিশেষ পুস্তক বা ধর্মগুরুর প্রতি আনুগত্য দেখাতে হয় না। কাজটা তাই খুব কঠিন নয়। চাই শুধু মানসিক দৃঢ়তা, সোচ্চার ঘোষনা-''আমি মানবতায় বিশ্বাসী। কোনও প্রচলিত ধর্ম মানি না।''

এই 'মানি না' বলাটা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। কারণ মেনে চলারই দলে ভারী-তারা সংগঠিত। তাই মানবতাবাদীদের ও সংগঠিত হওয়ার সময় এসেছে। যাঁরা প্রতিকুল পরিবেশে একা লড়ছেন, তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেই এই সংগঠিত আন্দোলন আজ দানা বাধছে। তাঁদেরকে শুধু 'নাস্তিক পরিচয় আশ্রয় দিতে পারে না। তাই যতদিন না ধর্ম পরিচয় অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হচ্ছে-ততদিন বিকল্প হিসেবে মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাড়াতে, সমাজে মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এই মানবতাবাদীদের একজোট হতে হবে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে সমস্ত পৃথিবীতে যত মানবতাবাদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে-তারা সম্মিলিত ভাবে অন্য সব ধর্মালম্বীদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যেদিন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী হয়ে উঠবেন-সেদিন আর প্রয়োজন হবে না সংগঠন গড়ার বা সই করে ''মনুষ্যধর্মালম্বী'' হওয়ার।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে- ধর্মকে ঘিরেই আমাদের যত উৎসব, শিল্প, সংস্কৃতি, আনন্দানুষ্ঠান।

প্রচলিত ধর্মকে বাদ দিয়ে কি করে হবে উৎসব? ছুটি হবে কি উপলক্ষে? একেবারে যান্ত্রিক হয়ে যাবে যে সমাজজীবন!

এখন দেখা যাক ধর্মাচরণকে বাদ দিয়ে কিকি উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা যায়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে তো আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেলেন প্রচলিত মুর্তিপূজা আচার-বিচার বাদ দিয়ে কিভাবে উৎসবে মাতিয়ে রাখা যায় আশ্রমিকদের। আজকের মানবতাবাদীদেরও তাই বারো মাসে তেরো পার্বণ না থাকলেও চোদ্দরকম কর্মসূচী থেকেই যায়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা রক্তদান-চক্ষুদান-দেহদান শিবির তো আছেই বছরের যে কোনও সময়ে।

সত্যিই কি ধর্ম ছাড়া অনুষ্ঠান হয় না? ছুটি হয় না?

ভেবে দেখুন তো? শিশুর জন্মের পর তার নাম হবে। সে প্রথম ভাত খাবে। তার হাতেখড়ি হবে। এগুলো সবই তো আনন্দের এককটা উপলক্ষ। সবাই মিলে উৎসব করাই যায়, তার জন্য ঈশ্বর বিশ্বাস, পুজো প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারনের কি প্রয়োজন? তাছাড়া জন্মদিন, পরীক্ষা পাশ, বিবাহ (অবশ্যই আইনী মতে) এ সবেই তো সাধ্যমতো আনন্দ উৎসব করা যায়। কিন্তু যুক্তিবাদী, মানবধর্মীদের কাছে কোনটাই বাধ্যতামূলক নয়। না করলেই সাংঘাতিক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না। আর সময়মতো মরণোত্তর দেহদানকে সার্থক করতে হলে যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। শ্মশান যাত্রা নাই বা হলো- আত্মীয় বন্ধুদের ডাক পড়বেই দেহ দানের ব্যবস্থা পত্র করতে। তারপর সবাই মিলে স্মরণ সভার আয়োজন করাটাই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সবচেয়ে ভাল উপায় নয় কি? একটা ছুটির দিন বেছে নিয়ে প্রয়াত মানুষটির ছবি ও স্মৃতিকে ঘিরে গান, আলোচনা, জীবনী পাঠ সবই চলতে পারে। দিনক্ষন দেখে গঙ্গা স্নান, যজ্ঞ, মন্ত্র, মাথা নেড়াকরে অদ্ভুত পোষাক পরে কৃচ্ছ্রসাধন-এসবই অর্থহীন আর হাস্যকর। আত্মার অস্তিত্ব যেখানে নেই- সেখানে ‘‘আত্মার শান্তি’’ ইত্যাদি অর্থহীন কল্পনা। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ-তাতে কি জীবন অর্থহীন হয়ে যায়? এক শ্রদ্ধেয় মানুষের স্মৃতি, কর্ম ও শিক্ষাই তো তাকে অমর করে। তাহলে স্মৃতিচারনই তো সবচেয়ে ভালো উপায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের। আর সাধ্য না থাকলেও কারুর মৃত্যু উপলক্ষে বহু মানুষকে ডেকে ভুরিভোজন করানোও একরকমের অশ্লীল মূর্খতা মনে করে মানবধর্মীরা। তাদের প্রতিবাদকে সোচ্চার করতে তাই মানবতাবাদীরা সবচেয়ে মারাত্মক আর অর্থহীন দুটো ভুরিভোজের নিমন্ত্রনকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। একটি শ্রাদ্ধের খাওয়া আরেকটি পৈতে বা উপনয়ন। একটি কিশোরকে পৈতে পরিয়ে তাকে দ্বিজত্বে উত্তীর্ন করা হচ্ছে জঘন্য জাতপ্রথাকে স্বীকার করে নেওয়ার অমানবিক প্রথা। এই অনুষ্ঠান শিক্ষিত সমাজের লজ্জা। বাকী সব প্রচলিত অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার পালন বাদ দিয়ে প্রীতিভোজে অংশগ্রহন করতে মানবধর্মীদের আপত্তি নেই। তবে কোন বিবাহে পণের ব্যাপার জানা থাকলে তা অবশ্যই বর্জনীয় হবে।

এই ভাবে সমাজে অন্য ধর্মালম্বীদের মধ্যে থেকেও মানবতাবাদীরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে এবং সুযোগ মত মানবতার প্রচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে থাকে।

মানুষের সাম্যে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী আন্দলনও তো আনন্দ উৎসব।

এতক্ষন তো গেল পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলো, এরপর দেখা যাক সামাজিক অনুষ্ঠান। সমস্ত রকম পুজো প্রার্থনা, মন্ত্রচ্চারণ, অলীক ঈশ্বর ভক্তি, অমানবিক ব্যয়সাপেক্ষ আচার বিচার ও পুরোহিত-নির্ভরতা বাদ দিয়ে অর্থাৎ যুক্তিহীন সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আনন্দের উৎসবগুলোর একটা তালিকা করলে আমরা কি পাই?

নতুন ধান কাটার সময় ঘরে ঘরে পিঠেপুলির উৎসব দিয়ে শুরু করা যাক। কোন ধর্মীয় গন্ধ ছাড়াই এটি সারা ভারতে ও দুই বাংলায় জনপ্রিয় উৎসব। শীতের পর যুক্তিবাদী দিবস ১ মার্চ, গ্রীষ্মে নববর্ষ। বর্ষায় বৃক্ষরোপন তারপর শরতে আকাশ পরিষ্কার হতেই শারদীয় মেলা। তারপর ঝকঝকে আকাশে ঠান্ডার ছোঁয়া লাগতেই বাজী আর আলোর খেলা। মুর্তিপূজো আর পুরোহিতন্ত্র বাদ দিয়ে কি এগুলো উপভোগ করা যায় না? ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস আর তারপরই বই মেলার তোড়জোড়। এটা একটা উদাহরণ কলকাতা আর তার আশে পাশের মানুষের জন্য। এই ভাবে সময় ঋতু ও আবহাওয়া ভেদে প্রচলিত সব অনুষ্ঠানই রাখা যায় মানুষের ঈশ্বর ভীতিকে বাদ দিয়ে। যে অর্থ ব্যয় হয় শুধু দুর্গা পুজোয় তাই দিয়ে বিগত বর্ষায় বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করেও খরচ করা যায় প্রতি এলাকায় স্থায়ী কিছু গঠন মূলক কাজ করতে-পার্ক, লাইব্রেরি, হাসপাতাল ইত্যাদি। নতুন কিছু মানেই তো কিছু মানুষের কর্ম সংস্থান, কিছু প্রতিভার বিকাশ। ছুটির দিনগুলোকে একটু অদল বদল করে নিলে কতগুলো নতুন ছুটি পাওয়া যাবে- যেমন বিজ্ঞান দিবস, যুক্তিবাদী দিবস, মানবাধিকার দিবস। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেশ শুদ্ধ সকলের ছুটি চলবে না। তার বদলে আপৎকালীন বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে ছুটি ঘোষনা করা হবে। যেমন বন্যাত্রানে সাহায্য করার জন্য শহরের মানুষের ছুটি, মহামারী বা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটলেও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য ছুটি। তাছাড়া খুব বর্ষা বা খুব শীত বা খুব গরমে টানা ক'দিন ছুটি দিলে কাজের একঘেয়েমি কাটে- সময় ও শক্তির অপচয় বন্ধ হয়। অথবা রক্তদানের ছুটি, বিশ্বকাপ খেলা দেখার ছুটি ইত্যাদি কিছু নতুন যোগ করা যায় যেগুলো ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রতিটি মানুষই কাজে লাগাতে পারে। অবাঞ্ছিত রীতিনীতি বাদ দিলে বাদ হয়ে যাবে অনেক কিছুই- বাদ হয়ে যাবে নিষ্ঠুর বলি প্রথা, যা কোন সুস্থ মনের মানুষের অঙ্গা হতে পারে না। বাদ হয়ে যাবে দিনের পর দিন চলতে থাকা বিসর্জনের হামলা, যানযট, বাদ হয়ে যাবে অনাবশ্যক উপবাস- এটা খেও না, সেটা খেতে নেই- যা অধিকাংশ ভারতীয় মহিলার পেটের রোগের গোপন রহস্য, বাদ হয়ে যাবেবহু অর্থ ও সময়ের অপচয় যে অর্থ ও সময় কাজে লাগবে সুস্থ পরিবেশ গড়তে- শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। তাই টানা সাত দিন ছুটি বরাদ্দ থাক বইমেলা আর সাক্ষরতা প্রসারের কাজে।

এসবই কি মানবতাবাদীদের দিবাস্বপ্ন? নাঃ, বোধহয় এরকম দিন আসতে আর বেশি দেরি নেই।

দেরি যে নেই, তারই সংকেত মিলছে '৯৯ এর শিশু অধিকার সপ্তাহ'তে। হায়দ্রাবাদের পঞ্চাশটি

স্কুলের পাঁচ হাজার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে একটা সমীক্ষা চালিয়েছিলো ‘‘দিব্য দিশা’’ ও ‘‘প্রেরণা’’ নামের দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং স্কুলগুলোর মিলিত উদ্যোগ। তাতে ৬৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছে, ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠানের জন্য ছুটি বাতিল করা উচিৎ, সে ক্রিসমাসই হোক বা গনেশ পুজোই হোক। তাদের এই মতামত জমা পড়েছে স্কুল শিক্ষিকা দফতরের অধিকর্তা মনমোহন সিং এর কাছে।

****

সুমিত্রা পদ্মনাভন ভারতীয় মানবধিকার সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি। ভারতীয় মানবাধিকার সমিতি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’র শাখা।

****

প্রবন্ধটি ‘‘দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম ’’ নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এবং লেখকের অনুমতি নিয়ে মুক্ত-মনা ’য় প্রকাশের জন্য অনুলিখিত।

****

অনুলিখনে : অনন্ত । তারিখ : ৩-০৪-০৫

ananta_atheist@yahoo.com